দ্বাদশ অধ্যায়

মানব উন্নয়ন

মানব উন্নয়নের গুরুত্ব পৃথিবীর সকল দেশে সমভাবে স্বীকৃত। উন্নয়ন পরিমাপের ক্ষেত্রে এখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনই একমাত্র নির্দেশক নয়; মানব উন্নয়নও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্যায় নির্ণয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক। এ কারণে বর্তমান সময়ে মানব উন্নয়ন বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। উন্নয়নের স্তর নির্বিশেষে যে কোন দেশের জনসাধারণের জীবন যাপনে দীর্ঘ জীবন, জ্ঞান অর্জন এবং সম্পদে প্রবেশাধিকার -এ তিনটি অপরিহার্য ক্ষেত্রে সুযোগ প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে অধিকার অর্জন নিশ্চিত হলে জনগণ দীর্ঘ সুস্বাস্থ্যময় পরিপূর্ণ জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করতে পারে।

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশে জীবনমান উন্নয়নে, দারিদ্র বিমোচনে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল অঙ্গীকার হচ্ছে মানব কল্যাণ। সরকার এ অঙ্গীকার অনুযায়ী তিন বছর মেয়াদি পূর্ণাঙ্গ দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র প্রণয়ন করে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবন মান উন্নয়নের মাধ্যমে মানব উন্নয়নের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

মানব উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে ব্যয়

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক ও ভৌত উভয় প্রকার উৎপাদনশীল সম্পদ সৃষ্টি করতে হলে প্রয়োজন সামাজিক খাতে ব্যয়। কারণ, সামাজিক খাত উৎপাদন, আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিতে অধিকতর মূল্য সংযোজনে যথেষ্ট অবদান রাখে। বাংলাদেশ সরকার বিগত কয়েক বছরে সামাজিক খাত উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি বরাদ্দের শতকরা ২০ ভাগের অধিকহারে অর্থ বরাদ্দ করে আসছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতকে মানব সম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে কয়েক বছরের বাজেটে শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। অনুরূপভাবে স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও বাস্তবানুগ কর্মসূচি গ্রহণ ও জনসংখ্যা খাতের বিভিন্ন সূচক যথা-প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, টিবি ও এইডসসহ অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে সুস্বাস্থ্যময় ও সবল জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করে তাদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর হতে ২০০৪-০৫ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে সামাজিক খাতে অনুন্নয়ন বাজেট ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর সমন্বিত বরাদ্দ নিম্নে সারণি ১২.১ এ দেখানো হ'ল। লক্ষ্যণীয় যে, এখাতে গত এক দশকে অনুন্নয়ন বাজেট ও এডিপি মিলিয়ে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে।

সারণি ১২.১ঃ কতিপয় মন্ত্রণালয়ের সামাজিক খাতে সরকারি বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

	৯৫-৯৬	৯৬-৯৭	৯৭-৯৮	৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫
শিক্ষা, ধর্ম এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	৩৬৬৩.৭	৩৯৬১.৩	৪২৮৯	৪৮৫০	৫৪৩০	৬০৭৯	৬০৬৩	৬৭৩৬	৪৮৭৭.৬৫	৭৯৯৯.১৮
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	১৬১১	১৮৩৪.২	১৯৬৪	২০৮০	২৩৬৩	২৬২৭	২৬৪৯	২৭৯৭	৩৪৪৪.৭২	৩৮০৮.৩১
যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি	১২০.৬৩	১৯৩.২৩	১৯১	১৭৬	২২৪	২৪৮	২১৭	২৫৩	২৫৬.৬৪	২৮২.৭২
শ্রম ও জনশক্তি	৩১.৪৮	৩৩.৪৫	৩৭	৩৮	৪৬	৫৪	১৩৩	৭০	৫৫.৫০	৮২.১৪
সমাজ কল্যাণ, মহিলা বিষয়ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	১৫২.৩৪	১৮৭.৯২	১৯৯	২৫৫	২৯৪	৩২২	৩৫৪	৪৮৪	৭১২.৬০	১১৮৮.৭১
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক			১৬৮	৭৪	১৭৮	২০৫	২০১	১৮৩	১৬২.৬৪	২৬৩.৫৪
মোট বরাদ্দ (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	৫৫৭৯.২	৬২১০.১	৬৮৪৮	৭৪৭৩	৮৫৩৫	৯৫৩৫	৯৬১৭	১০৫২৩	১১৬৯৬.৯৯	১৩৬২৪.৬০

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। তথ্যসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক। ২০০৪-০৫ মূল বাজেট ভিত্তিক।

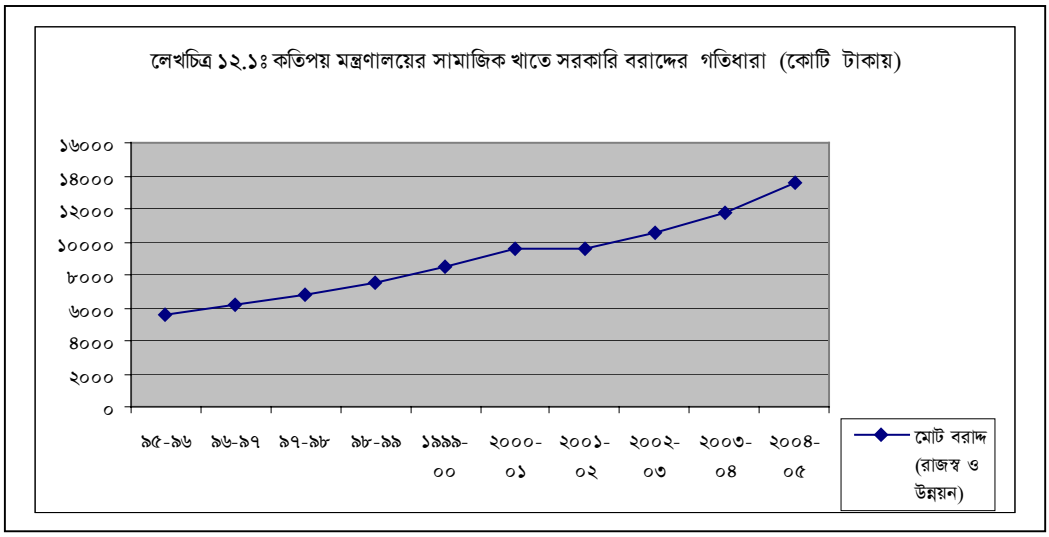

শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম

শিক্ষা উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি। শিক্ষা বাংলাদেশ সরকারের সবচেয়ে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত। মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষা অন্যতম হাতিয়ার। তাই শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে এবং এর গুণগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য সরকার উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে আসছে।

দারিদ্র বিমোচন ও মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করতে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও উচ্চ শিক্ষার সকল স্তরে সকলের জন্য কাঙ্খিত সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন ইতোমধ্যে প্রতিবেদন পেশ করেছে এবং তার পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়ন সহায়ক বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ, ‘‘জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কমিশন’’ স্থাপন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্তৃপক্ষ গঠন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশনা ও বিতরণ কার্যক্রম বেসরকরিকরণ, শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, বেসরকারি শিক্ষক/কর্মচারী অবসর সুবিধা আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন, পাবলিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার, এমপিওভুক্তির নীতিমালা সংশোধন, কলেজের গভর্নিং বডি ও স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি পুনর্গঠন। ভোকেশনাল ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার, শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে ওভার সাইট কমিটি গঠন, Performance based subvention, School based assessment প্রথা চালুকরণ উল্লেখযোগ্য।

নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে জেন্ডার বৈষম্য দুরীকরণপূর্বক নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে নারীদের অংশ গ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান, বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষার ফি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রাপ্ত মেয়েদের বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সাধারণ মেধাবৃত্তি এবং বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষাবৃত্তির পরিমাণ ও সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে পলিটেকনিক এবং টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে ডাবল শিফট চালু করা হয়েছে।

পঠন-পাঠন পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সমগ্র দেশের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন-নতুন ভবন নির্মিত হচ্ছে এবং বিদ্যমান ভবনসমূহের সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে

আসবাবপত্র, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বইপত্র সরবরাহের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। তথ্য প্রযুক্তি প্রসারের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কম্পিউটার বিতরণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উচ্চ শিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চাহিদা প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলার লক্ষ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার বেসরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ১৯৯২ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ পাশ করে। এ উদ্যোগের ফলে দেশে এ পর্যন্ত ৫৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। অপরদিকে ৪টি বিআইটিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার ফলে সরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১টি-তে। সম্প্রতি সরকার কর্তৃক গঠিত একটি কমিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার গুণগত মান পর্যালোচনা করে সরকারের নিকট প্রতিবেদন পেশ করেছে।

প্রাথমিকোত্তর শিক্ষা

প্রাথমিকোত্তর শিক্ষা যেমন-মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যানবেইস-এর ২০০৪ সালের তথ্য অনুযায়ি বর্তমানে বাংলাদেশে ১৭৩৮৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১২২৫টি সাধারণ কলেজ, ৮৪১০টি মাদ্রাসা, ৭৭টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৬৪টি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, ২১টি পাবলিক ইউনিভার্সিটি ও ৫১টি প্রাইভেট ইউনির্ভারসিটিসহ বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ২০০৫ সনের সাময়িক তথ্য অনুযায়ী নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৮৫৭৮৬৩৭ জন, কলেজ পর্যায়ে ১৬৬৪০৭৪ জন এবং মাদ্রাসা শিক্ষায় ৩৫,৯৭,৪৫৩ জন ।

২০০৪-০৫ অর্থবছরের মূল এডিপিতে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন ও গুণগত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে ৩৮টি চলতি প্রকল্পে মোট ১৩৫৮ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উপবৃত্তিপ্রাপ্ত মেয়েদেরকে বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান করছে। তদুপরি ৫টি প্রকল্পের আওতায় চলতি ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ২৫ লক্ষ মেয়েকে ২০৯ কোটি টাকার উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্যানুসারে ৪টি প্রকল্পের আওতায় ২০০৩-০৪ অর্থবছরে মোট ৩৯,০৪,৭২৩ জন ছাত্রী উপবৃত্তি ভোগ করেছে।

সরকার কর্তৃক গৃহীত নারী শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত যথাক্রমে ৪৭ঃ৫৩। মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় ৬৩০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ‘‘টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট’’ নামের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার মনোন্নয়নে এ প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

Secondary Education Sector Improvement Project (SESIP) প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ৫২টি জেলা শিক্ষা কমপ্লেক্স এবং ৪টি জোনাল শিক্ষা কমপ্লেক্স -এর নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ। এছাড়াও এ প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং আরও সংস্কারমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে SESIP -২ প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত একটি স্টাডি পেপার প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় উচ্চ শিক্ষার দীর্ঘ মেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় কাজ করছে। শিক্ষার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে সারা দেশে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নতুন ভবন নির্মিত হচ্ছে এবং বিদ্যমান ভবনসমূহের সংস্কার ও মেরামত কাজ চলছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৪টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। তাছাড়া ৪টি বিআইটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষাই সকল শিক্ষার মৌল সোপান। প্রাথমিক শিক্ষার অপরিমেয় গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। সাংবিধানিক লক্ষ্যসমুহ অর্জনের ধারাবাহিকতায় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে জাতীয় সংসদ কর্তৃক "প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামুলককরণ) আইন-১৯৯০" পাশ হয় এবং ১৯৯৩ সাল হতে সারাদেশে বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসুচি চালু করা হয়। সরকার ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ৭৬৭৯.৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। চলতি অর্থ বছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের ৪২.৮৬% প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে যার পরিমাণ ৩২৯১.৭৯ কোটি টাকা। Millennium Development Goals এবং PRSP -এর আলোকে ২০১৫ সালের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশিচত করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি ভবিষ্যতে যত দিন প্রয়োজন অব্যাহত রাখা হবে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তির অর্থ উত্তোলনের ক্ষমতা মাতাকে প্রদানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি বর্তমান সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটেছে।

বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯,৫৩৯টি। এ সংখ্যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৮,০০০-এ। এ সময়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় অভিন্ন থাকলেও (৩৭,৭০০ এর কাছাকাছি) বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১,৮৪৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৪,৭৩৬ তে দাঁড়ায়। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির অনুপাত ছিল ৫৫ঃ৪৫। বর্তমানে তা প্রায় ৫০ঃ৫০-এ উন্নীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ পদে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে ২১.০৯ শতাংশ থেকে বর্তমানে প্রায় ৩৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে পাঁচ বৎসর মেয়াদি শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার ৪০.৭০% থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬৭%-এ। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ১৯৯০ সাল হতে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছে। নিম্নে ১৯৯০-২০০২ পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি এবং ছাত্র-ছাত্রীর হার সারণি ১২.২ -এ দেখানো হ'ল।

সারণি ১২.২ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী[২] ভর্তি (১৯৯০-২০০২)

(হিসাব ল‡ক্ষ)

বছর	মোট	ছাত্র (%)	ছাত্রী (%)
১৯৯০	১২০.৫০	৬৬.৬০ (৫৫.৩)	৫৩.৯০ (৪৪.৭)
১৯৯১	১২৬.৩৫	৬৯.১০ (৫৪.৭)	৫৭.২৫ (৪৫.৩)
১৯৯২	১৩০.১৭	৭০.৪৯ (৫৪.২)	৫৯.৬৯ (৪৫.৮)
১৯৯৩	১৪০.৬৭	৭৫.২৬ (৫৮.৫)	৬৫.৪১ (৪৬.৫)
১৯৯৪	১৫১.৮১	৮০.৪৮ (৫৩.০)	৭১.৩৩ (৪৭.০)
১৯৯৫	১৭২.৮০	৯০.৯৪ (৫২.৬)	৮১.৯০ (৪৭.৪)
১৯৯৬	১৭৫.৮০	৯২.১৯ (৫২.৪)	৮৩.৬১ (৪৭.৬)
১৯৯৭	১৮০.৩২	৯৩.৬৫ (৫১.৯)	৮৬.৬৭ (৪৮.১)
১৯৯৮	১৮৩.৬১	৯৫.৭৭ (৫২.২)	৮৭.৮৪ (৪৭.৮)
১৯৯৯	১৭৬.২২	৯০.৬৫ (৫১.৪)	৮৫.৫৭ (৪৮.৬)
২০০০	১৭৬.৬৮	৯০.৩৩ (৫১.১)	৮৬.৬৯ (৪৮.৯)
২০০১	১৭৬.৫৯	৮৯.৯০ (৫১.০)	৮৬.৬৯ (৪৯.০)
২০০২	১৭৫.৬২	৮৮.৪২ (৫০.৩)	৮৭.২০ (৪৯.৭)

উৎসঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (প্রাইমারি এডুকেশন ষ্ট্যাটিসটিকস্ ইন বাংলাদেশ, ২০০২)।

[২] বন্ধনীর মধ্যস্থ সংখ্যা শতকরা হিসাব নিদের্শক।

প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং মানোন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ

দেশে প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত দিক থেকে উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণের পাশাপাশি বর্তমানে গুণগতমান অর্জনের জন্য ১১টি উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় ৪৯৩৩.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে "প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী-২" বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচীর আওতায় ৩৫,০০০ জন সহকারী শিক্ষক, ১,০০০ জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ১২৮ জন কম্পিউটার অপারেটর, ২১৬ জন পিটিআই ইন্সট্রাক্টর এবং ৩৯৭টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের জন্য ৩৯৭ জন ইন্সট্রাক্টর ও ৩৯৭ জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার নিয়োগ দেয়া হবে। এ কর্মসুচীর আওতায় ১৫ হাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩০ হাজার নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা হবে। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে "প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী-২" এর আওতায় ৭,১০০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ২টি করে ১৪,২০০ নুতন শ্রেণীকক্ষ এবং ৭,১০০টি আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন করা হবে। শিক্ষকদের জন্য এসব বিদ্যালয়ে ৭,১০০টি টয়লেট নির্মাণ করা হবে। এ সময়ে ২০৫টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ ও ২৯০টি উপজেলা শিক্ষা অফিসের সম্প্রসারণ ও মেরামত করা হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বঞ্চিত ও শিক্ষাচক্র হতে ঝরে পড়া ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সের নারী-পুরুষ, যারা ইতঃপুর্বে গণশিক্ষা কর্মসুচির আওতায় সাক্ষরজ্ঞান লাভ করেছেন, তাদের অর্জিত শিক্ষাকে ধরে রাখা, শানিত করা এবং কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদেরকে কর্মক্ষম নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ (পিএলসিইএইচডি-১) বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের ছাগল পালন, গবাদি পশু মোটা-তাজাকরণ, হাঁস-মুরগি পালন, মৌমাছির চাষ, গাভী পালন ও দুগ্ধ খামার স্থাপন, সেলাই ও দর্জি বিজ্ঞান, মৎস্য চাষ, নার্সারী, সবজি ও ফুল-ফল চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি আয়বর্ধক পেশায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

"সবার জন্য শিক্ষা" কার্যক্রম নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার "রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন" শীর্ষক ৩৯০.৭২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে যা জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপঃ

- স্কুল বহির্ভুত,সুযোগ বঞ্চিত ৭-১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিকরণ;
- কেন্দ্রভুক্ত ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন;
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ।

প্রকল্পের আওতায় নতুন বা বিদ্যমান প্রতিটি কেন্দ্রে ১ম থেকে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত মাথাপিছু মাসিক ৫০.০০ টাকা হিসেবে এবং ৪র্থ থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ৬০.০০ টাকা হিসেবে শিক্ষাভাতা প্রদান করা হবে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের ২সেট ইউনিফর্মের খরচ বাবদ ১ম থেকে ৩য় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বার্ষিক ২০০.০০ টাকা এবং ৪র্থ থেকে ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বার্ষিক ২৫০.০০ টাকা হারে প্রদান করা হবে। এছাড়াও ৫ম শ্রেণীর প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী প্রতি ২০০.০০ টাকা প্রদান করা হবে।

দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরের (বাস্তবতার নিরিখে ও চাহিদার প্রেক্ষিতে সিটি কর্পোরেশনের বাইরে ১০ কিমি পর্যন্ত প্রকল্প কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে) কর্মজীবী শিশু ও কিশোর কিশোরীদের উন্নততর জীবন অনুসন্ধানে শিক্ষা, নিরাপত্তা ও উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ২০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে সরকার জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০০৯ পর্যন্ত সময়ে শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র নিরসনে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে।

সরকার শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীকে আর্থিক সহায়তায় রূপান্তর করে দেশব্যাপী উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু করেছে। চলতি অর্থ বছরে সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে ৫২০ কোটি টাকা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে। এতে প্রায় ৫৫ লক্ষ দরিদ্র শিক্ষার্থী উপকৃত হচ্ছে। একটি দরিদ্র পরিবার এক সন্তান বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য ১০০/- টাকা এবং একাধিক সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য ১২৫/- টাকা হারে মাসিক উপবৃত্তি পাচ্ছে। উপবৃত্তির অর্থ উত্তোলনের অধিকার মা-কে দেয়ায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীর ক্ষমতায়নকে আরো উৎসাহ ও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর ২০% ছাত্র-ছাত্রীর বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামুলক করা হয়েছে। প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় পাশের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৫৪.২১% এ উন্নীত হয়েছে। সরকার বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করে টেলেন্টপুল বৃত্তি ২০,০০০টি এবং সাধারণ বৃত্তি ২৫,০০০টি-তে উন্নীত করেছে। দেশের শ্রমজীবী শিশুদের জন্য শহর ও নগরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। শ্রমজীবী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখার জন্য শিশু কল্যাণ ট্রাষ্টের মাধ্যমে বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এই বৃত্তিপ্রাপ্তদের এস,এস,সি পরীক্ষা পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে ৪০০/- টাকা এবং মাধ্যমিক স্তরে ৬০০/- টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

সুস্থ ও আকর্ষণীয় শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচীর সহায়তায় বর্তমানে উচ্চ খাদ্য ঘাটতি এলাকা হিসেবে বিবেচিত কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট এবং ঢাকার কিছু বস্তি এলাকায় 'স্কুল ফিডিং' কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে ৩,৭৫৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ৭,২৬,৯১৭ জন ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চ খাদ্যমানের বিস্কুট প্রদান করা হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। দেশের ৫৪টি পিটিআই-তে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাড়াও ইতোমধ্যে রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৫,৯৯৮ জন শিক্ষককে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসুচী-২ এর আওতায় ৯০,০০০ হাজার শিক্ষক-কে সি-ইন-এড কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীকে (নেপ) স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়েছে।

সরকার মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শুন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শুন্যপদে ৬০ শতাংশ শিক্ষিকা নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়ার ফলে শিক্ষিকার আনুপাতিক হার বর্তমানে প্রায় ৩৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বিগত ৩ বছরে এপর্যন্ত রাজস্বখাতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩,২২০ জন প্রধান শিক্ষক এবং ২৮,৬৯০ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া উন্নয়ন খাতের আওতায় আরো ৫,৯৪৬ জন সহকারী শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বর্তমান শিক্ষা প্রশাসনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ২৯৯টি সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং ১২৩টি উপজেলা শিক্ষা অফিসার পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামুল্যে বই সরবরাহ করছে। ২০০৫ সালের ২ জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিয়েছেন। ২০০৫ শিক্ষাবর্ষে বিনামুল্যে বিতরণের জন্য মোট ৬ কোটি ৬৪ লক্ষ বই মুদ্রণ করা হয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য বই ছাপানোর কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে। দেশ, কাল, সমাজ ও জাতির যুগোপযোগী চাহিদার আলোকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা, নারী শিক্ষা, পরিবেশ তথা বিজ্ঞানময় বর্তমান জীবন এবং একবিংশ শতাব্দীর তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাক্রম চালু করার কার্যক্রম চলছে। ২০০৪ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪০টি জেলার মধ্য হতে ১২টি জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদেরকে ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৮৪৭টি বই বাফার স্টক থেকে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

সরকারের দারিদ্র বিমোচন প্রক্রিয়ায় সহায়ক উল্লিখিত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশ হতে নিরক্ষরতা দুর হওয়ার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার কাংখিত গুণগত মানোন্নয়ন হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উন্নয়ন কার্যক্রম

স্বাস্থ্য সংবিধান-স্বীকৃত একটি মৌলিক অধিকার। এ মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সরকার স্বাস্থ্যখাতকে অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গ্রহণ করেছে। মানব সম্পদের উন্নয়ন একটি উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। গত দশকে দেশের স্বাস্থ্য সেক্টরে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রজনন হার ও মৃত্যুহার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

সারণি ১২.৩- এ ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার ইত্যাদি বিষয়ে সাধিত অগ্রগতি দেখানো হয়েছে।

সারণি ১২.৩ ঃ স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা[৭]

সূচক সমূহ	বিবেচ্য বিষয়	১৯৯৪	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২
স্থূল জন্ম হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	২৭.০	২৬.৫	২৫.৬	২১.০	১৯.৯	১৯.২	১৯.০	১৮.৯	২০.১
	শহর	২০.২	১৯.৪	১৯.০	১৬.২	১৪.০	১৩.৮	১৩.৭	১৩.৬	১৬.৬
	পল্লী	২৯.১	২৮.৫	২৭.৮	২৪.৫	২১.০	২০.৯	২০.৮	২০.৭	২১.০
স্থূল মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৯.০	৮.৪	৮.১	৫.৫	৪.৮	৫.১	৪.৯	৪.৮	৫.১
	শহর	৭.১	৬.৭	৬.৫	৪.২	৩.৭	৩.৫	৩.৫	৩.৪	৩.৮
	পল্লী	৯.৩	৯.০	৮.৮	৬.৫	৫.৪	৫.৪	৫.৩	৫.২	৫.৪
বিবাহের গড় বয়স	পুরুষ	২৭.৭	২৭.৫	২৭.৬	২৭.৬	২৭.৬	২৭.৭	২৭.৭	২৭.৮	২৫.৬
	মহিলা	১৯.৮	১৯.৯	২০.০	২০.০	২০.২	২০.৩	২০.৪	২০.৪	২০.৬
ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা		**৪৭২৫**	**৪৮৬৬**	**৪৯৫৫**	**৪৯১৫**	**৪৬৭১**	**৪৪৩৯**	**৪২১৮**	-	-
প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল	জাতীয়	৫৮.০	৫৮.৭	৫৮.৯	৬০.১	৬০.৬	৬৭.৬	৬৮.২	৬৮.৩	৬৪.৯*
	শহর	৬০.০	৬০.৯	৬১.২	৬২.৩	৬২.৫	৭০.৫	৭২.৬	৭২.৮	৬৭.২*
	পল্লী	৫৭.৭	৫৭.৫	৫৮.২	৫৯.৪	৫৯.৯	৬৬.৭	৬৬.৬	৬৬.৭	৬৪.৪*
শিশু[৪] মৃত্যু হার	জাতীয়	৭৭	৭১	৬৭	৬০	৫৭	৫৯	৫৮	৫৬	৫৩
	শহর	৫৭	৫৩	৫০	৪৯	৪৭	৪৬	৪৪	৪৩	৩৭
	পল্লী	৭৯	৭৮	৭৬	৬৯	৬৬	৬৩	৬২	৬০	৫৭
শিশু[৫] মৃত্যু হার	জাতীয়	১২.১	১২.০	১১.৮	৮.২	৬.৩	৫.৭	৪.২	৪.১	৪.৬
মাতৃ[৬] মৃত্যু হার	জাতীয়	৪.৫	৪.৫	৪.৪	৩.৫	৩.০	৩.২	৩.২	৩.১৫	৩.৯১**
	শহর	৩.৯	৩.৮	৩.৮	৩.১	২.৯	২.৬	২.৬	২.৫৮	২.৭৩**
	পল্লী	৪.৬	৪.৫	৪.৫	৩.৮	৩.৪	৩.৩	৩.৩	৩.২৬	৪.১৭**
গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের হার		৪৬.৩	৪৮.৭	--	৫০.৯	৫১.৫	৫৩.৬	৫৩.৬	৫৩.৯	৫৩.৪
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		৩.৬	৩.৫	৩.৪	৩.১	৩.০	২.৬	২.৬	২.৫৬	২.৫৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দিতে এবং স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নে বর্তমান সরকার দৃঢ় অংগীকারাবদ্ধ। এ অঙ্গীকার পুরণে বর্তমান সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ২০০৩-২০০৬ সাল মেয়াদী "স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত কর্মসুচী (HNPSP)" গ্রহণ। এ কর্মসুচির মুল লক্ষ্য হলো, সকল জনগণের বিশেষতঃ মহিলা, শিশু, বয়স্ক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার টেকসই উন্নয়ন। এ কর্মসুচির উন্নয়ন খাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৬০০.০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে জিওবি ১৪০০.০০ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৩২০০.০০ কোটি টাকা। ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে এ কর্মসুচির বরাদ্দ ১৬৮৮.১০ কোটি টাকা, যা ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের মুল এডিপি বরাদ্দের তুলনায় ১০.৪২% বেশী। বাংলাদেশ সমন্বিত পুষ্টি প্রকল্পের (NINP) সাফল্যকে সামনে রেখে দেশের পুষ্টি সমস্যা নিরসনকল্পে সরকার ৬৪০.৯৭ কোটি টাকা (জিওবি-৭০.৩৫ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য-৫৭০.৬২ কোটি টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত "জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প (এনএনপি)" জুলাই ২০০০-জুন ২০০৪ মেয়াদে বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে HNPSP এর পুষ্টি কার্যক্রমের সাথে NNP এর কার্যক্রম একীভুত করা হয়েছে। এছাড়া একটি দীর্ঘ মেয়াদী HNP Strategic Investment Plan প্রস্তুত করে তা বাস্তবায়নের জন্য Health, Nutrition & Poulation Programme Proposals (HNPPP) প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মেয়াদ ২০০৩-২০১০ এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১৫৬৮.৬০ কোটি টাকা।

---

[৪] প্রতি হাজার জীবিত জন্মে

[৫] ১ থেকে ৪ বছর বয়সী (প্রতি ১ হাজার জন্মে)

[৬] প্রতি হাজার প্রসবে।

[৭] বিবিএস হতে সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পূর্ববর্তী বছরে প্রদত্ত সংখ্যাসমূহ আংশিক সংশোধিত।

* সাময়িক

** আইসিডি'র ১০ম রিভিশন অনুযায়ী।

সরকার কর্তৃক গৃহীত এ খাতভিত্তিক কর্মসুচি অন্তর্বতকালীন দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্রে বিধৃত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রূপরেখা অনুসরণে প্রণয়ন করা হয়েছে যা দারিদ্র বিমোচনে এবং সরকারের Millennium Development Goals (MDGs) অর্জনে সহায়তা করবে। এছাড়াও জনসাধারণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান জাতি তৈরী করে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে।

HNPSP-তে এ সংক্রান্ত যে সকল বিষয় তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো হলো ঃ

- অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য সেবার জন্য ন্যুনতম ৬৫% বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য এবং যে সকল ভৌগোলিক এলাকা তুলনামুলকভাবে স্বাস্থ্য সেবা ও সুবিধা বঞ্চিত যে সব এলাকায় অগ্রাধিকারসুচক আর্থিক বরাদ্দ ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, এবং
- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার ব্যবস্থাপনা ও গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিকেন্দ্রীকরণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে লোকাল লেভেল প্ল্যানিং কার্যক্রমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দেশের প্রায় ৮৫% জনসংখ্যার চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকার প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের শয্যা সংখ্যা ৩১ হ'তে ৫০-এ উন্নীত করার কাজ হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে ৮৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের শয্যা সংখ্যা উন্নীতকরনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ১০টি জেলা হাসপাতালকে ৫০ থেকে ১০০ শয্যায় এবং আজিমপুরস্থ MCHTI-কে ১০০ থেকে ১৭৩ শয্যায় উন্নীতকরণের কাজ শেষ হয়েছে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অবকাঠামোগত উন্নয়নমুলক কার্যক্রম সম্পন্ন হলে চিকিৎসা সেবার পরিধি আরো বৃদ্ধি পাবে ও জনসাধারণের চিকিৎসা সেবার চাহিদা মিটানো সম্ভব হবে। প্রকৃত চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে সরকার চিকিৎসা সেবা ব্যবস্থার পরিধি ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারণ করছে। এই উদ্দেশ্যে "বগুড়ায় শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল", কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ২৫০ শয্যা থেকে ৫০০ শয্যায় উন্নীতকরণ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ৫০০ শয্যা থেকে ১০০০ শয্যায় উন্নীতকরণ, টাঙ্গাইল ও পাবনা জেলা হাসপাতালকে ১০০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, চাঁদপুর জেলা হাসপাতালকে ৫০ শয্যা থেকে ২০০ শয্যায় উন্নীতকরণ, "জাতীয় চক্ষু ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালকে ১০০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ", ঢাকার শেরে বাংলানগরে "ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব নিউরোসাইন্সেস স্থাপন", ৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউটকে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরণ(প্রথম পর্যায়ে ১৫০ শয্যা), দিনাজপুরে ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন (প্রথম পর্যায়ে ২৫০ শয্যা), ৫টি নতুন নার্সিং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এবং বগুড়ায় নার্সিং কলেজ এর নির্মাণ কাজ চলছে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে টিচিং মর্গ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এ ছাড়া পঞ্চগড় নার্সিং ইনষ্টিটিউট শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। ৯টি ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল ও ৩টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল-এর নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে। ময়মনসিংহের ভালুকায় ১টি, সিরাজগঞ্জে ১ টি, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন স্থানে ১টি ও ফেনীতে ১টি ট্রমা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং দাউদকান্দিতে ১টি ট্রমা সেন্টার নির্মাণের কাজ চলছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গনে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি বার্ন ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে এটাকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরন করার কাজ চলছে। ঢাকার মহাখালীতে 'জাতীয় এ্যাজমা সেন্টার (২য় পর্যায়)' নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও নিম্নোক্ত কাজগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবেঃ-

- ৬টি ৩১ শয্যা বিশিষ্ট নতুন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন,
- ৮টি ২০ শয্যা বিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল স্থাপন,
- জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ২০ শয্যার কোয়ারেন্টাইন হাসপাতাল স্থাপন,
- ঢাকায় সরকারী কর্মচারীদের জন্য একটি ২৫০শয্যা বিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল স্থাপন,
- চট্টগ্রামে একটি আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা,

- ময়মনসিংহ ও ঝিনাইদহ জেলায় ২ টি খাবার স্যালাইন উৎপাদন ও সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন,
- ঝিনাইদহে ২৫ শয্যার একটি শিশু হাসপাতাল স্থাপন,
- ঝিনাইদহ জেলায় একটি স্বাস্থ্য সহকারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (MATI) স্থাপন,
- রাজশাহীতে ১০০ শয্যার ১টি ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন,
- বরিশালে ১০০ শয্যার ১টি ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন,
- ঢাকার শেরে-বাংলা নগরস্থ জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট এর বিদ্যমান কাঠামো পুনঃ বিন্যাস করে CCU সমপ্রসারণ,
- ঢাকার মীরপুরে ৫০০শয্যা বিশিষ্ট ১টি হাসপাতাল স্থাপন,
- ঢাকার বাসাবোতে ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট ১টি হাসপাতাল স্থাপন,
- ঢাকার কুর্মিটোলায় ৫০০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন,
- ঢাকার শ্যামলীতে ২৫০ শয্যার যক্ষ্মা হাসপাতাল নির্মাণ(প্রথম পর্ব-১৫০ শয্যা),
- ঢাকায় ১টি জাতীয় মেডিকেল বিশ্ববিদালয় স্থাপন,
- ঢাকায় একটি ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব হেলথ ম্যানেজমেন্ট স্থাপন।

উন্নয়নমুলক এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে চিকিৎসা সেবা দ্বারা জনগণ উপকৃত হবে। সকল হাসপাতালের শয্যা সংখ্যার বৃদ্ধি সম্পন্ন হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা জনগণের চিকিৎসা নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিশু ও মাতৃ মৃত্যু হার উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাবে। বিগত তিন বছরে সরকারী হাসপাতালের মধ্যে ১৮টি জেলা হাসপাতালে মোট ৮৭৫টি, বিশেষায়িত ও অন্যান্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২৯১২টিসহ মোট ৩৭৭৭টি শয্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে সরকারী হাসপাতালসমুহে মোট শয্যা সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৫১৮৮টি।

এছাড়া সম্প্রতি সরকার ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে "ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫" নামে একটি আইন প্রণয়ন করেছে।

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাই বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ বাংলাদেশ। ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সার্ভে, ২০০২ এবং আদম শুমারি ২০০১ অনুসারে এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে যথাক্রমে ৯০১ জন ও ৮৩৯ জন লোক বসবাস করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৯১ সালের ২.০১% এর তুলনায় বর্তমানে ১.৪৮%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেলেও মোট জনসংখ্যার ক্রমাগতবৃদ্ধি আমাদের এ ছোট্ট ভূ-খন্ডের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করেছে। কাজেই বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা পূর্বক সহস্রাব্দের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে হলে একদিকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং অপরদিকে মানব উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ঃ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশু স্বাস্হ্য সেবা কার্যক্রম ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে এবং তা আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার (সিপিআর) ১৯৭৫ সালে শতকরা ৮ ভাগ হতে ২০০৪ সালে ৫৮.১% এ উন্নীত হয়েছে । সিপিআর এর ক্রমোন্নতি মোট প্রজনন হার হ্রাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করেছে। মহিলা প্রতি মোট প্রজনন হার ১৯৭১-৭৫ সালে ৬.৩ হতে হ্রাস পেয়ে ২০০৪ সালে ৩-এ নেমেছে (সূত্রঃ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, মে ২০০৫)। সেইসঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩% থেকে হ্রাস পেয়ে ১.৪৮% হয়েছে। শিশু মৃত্যু ১৯৯৩-৯৪ সালের ৮৭ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০৪ এ ৬৫ (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) হয়েছে। বিবিএস -এর ২০০২ সালের তথ্যানুযায়ী বর্তমানে আমাদের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ৬৪.৯ বৎসরে উন্নীত হয়েছে।

বর্তমান ২০০৩-২০০৬ বৎসর মেয়াদী স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসুচীর আওতায় বাংলাদেশের জনগণ, বিশেষ করে মহিলা,শিশু ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পারিবারিক অবস্থা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়ন, মাতৃমৃত্যু, নবজাতক ও শিশু মৃত্যু এবং অসুস্থ্যতার হার হ্রাসে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে মাঠ ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবাদান কার্যক্রম শক্তিশালী করার মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনে বৃহত্তর পরিসরে পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

এ কর্মসূচির নির্ধারিত লক্ষ্যসমুহ নিম্নরূপী

- মোট প্রজনন হার (মহিলা প্রতি) ৩.০ থেকে ২.৮ এ নামিয়ে আনা (জুলাই ২০০৬ এর মধ্যে);
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৫৮.১% থেকে ৬৩% এ উন্নীত করা;
- পদ্ধতি পরিত্যাগকারীর হার ৪৮.৬% থেকে ৩০ % এ কমিয়ে আনা;
- মাতৃমৃত্যুর হার ৩.২ থেকে ২.৭৫ এ নামিয়ে আনা(প্রতি হাজার জীবিত জন্মে);
- নবজাতকের মৃত্যুর হার ৬৬ থেকে ৪৮ এ নামিয়ে আনা (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে);
- ৫ বছরের নীচে নবজাতকের মৃত্যুর হার ৮৮ থেকে ৭০ এ নামিয়ে আনা (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে);
- নিরাপদ প্রসব ১৩.৪% থেকে ২৫% এ উন্নীত করা;
- প্রসবপুর্ব পরিচর্যা ৪৮% থেকে ৬০% এ উন্নীত করা;
- প্রসবোত্তর পরিচর্যা ১৬% থেকে ৩০% এ উন্নীত করা;
- ৭,৫০,০০০ স্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্প্রসাদন করা;
- ৯,০০,০০০ আই ইউ ডি প্রয়োগ করা;
- ৩,৬৫,০০০ ইমপ্লান্ট প্রয়োগ করা

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতিঃ

- ১লা জানুয়ারী ২০০৪ হতে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত প্রতিটি মাঠকর্মীর জন্য পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিষ্টার (চতুর্থ সংস্করণ) বিতরণ করা হয়। এ ছাড়াও মাঠ কর্মীদের চাহিদা মোতাবেক সম্পুরক রেজিষ্টার মুদ্রণ করে সারাদেশে বিতরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপজেলা ও তদনিম্ন পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য ৫ (পাঁচ) ধরনের এমআইএস প্রতিবেদন ফরম মুদ্রণ করে সারা দেশে প্রতিটি উপজেলায় বিতরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

- বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে সেবা প্রদানের কাজ অব্যাহত রয়েছে। সেই সাথে স্থায়ী পদ্ধতির অগ্রগতি বৃদ্ধির জন্য মাঠ পর্যায়ে বিশেষ ক্যাম্প সংগঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া প্রতি মাসে প্রতি ইউনিয়নে ৮ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক সংগঠনের মাধ্যমে প্রসব পুর্ব সেবা, প্রসবোত্তর সেবা, ইপিআই, শিশু স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি তথ্য,বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের কাজ এগিয়ে চলেছে।

- জাতীয় পর্যায় থেকে মাঠ কার্যক্রম তদারকি জোরদার করা হয়েছে।

- ১৫০০ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রে নিরাপদ মাতৃত্ব, জরুরি প্রসুতি সেবা, ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপসন, নবজাতকের সেবা, বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি ও আসবাব শয্যাসহ মান উন্নীতকরণের কাজ অব্যাহত রয়েছে । ৪৪৭০ সংখ্যক ইউনিয়নের মধ্যে ৩৪৭৭ সংখ্যক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে ।

- পুরুষদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য এবং পুরুষ বন্ধ্যাকরণ (এন এস ভি) জনপ্রিয় করার জন্য মোবাইল ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে ।

- ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত ১২৮ জন ডাক্তারকে অব্স/গাইনী'র উপর এবং ১২২ জন ডাক্তারকে এনেসথেসিয়ার উপর এক বৎসর মেয়াদী প্রশিক্ষণ এবং ২৯৯ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) কে ছয় মাস মেয়াদী ৩টি ব্যবস্থাপনা ও নার্সিং কেয়ার এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- ডিসেম্বর, ২০০৪ পর্যন্ত ৩৭৬ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে ০৬ মাসব্যাপী মিডওয়াইফারী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমানে আরও ৪০ জন প্রশিক্ষণরত আছেন। এর ফলে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের ধাত্রীবিদ্যায় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে জরুরি প্রসুতি সেবা প্রদানে সহায়ক হবে।

- ডিসেম্বর, ২০০৪ পর্যন্ত ৬৩১ জন Skilled Birth Attendant (SBA), যারা কমিউনিটিতে কর্মরত (পরিবার কলাণ সহকারী ও মহিলা স্বাস্থ্য সহকারী) প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন ও ৪৪০ জন প্রশিক্ষণরত অছেন। এর ফলে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত হবে।

- বর্তমান আর্থিক সনে ৭৭ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ও মহিলা উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারকে এম আর এর উপর মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ মাতৃ মৃত্যু ও অসুস্থতা যেমন- সেপটিক এবরশন কমানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

- Violence Against Woman এর উপর ২২ জন ডাক্তার ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। Youth Friendly Service এর উপর ৩৭ জন ডাক্তার ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। Male Service এর উপর ১৫ জন ডাক্তার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২২৩ জন ডাক্তার ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ, গর্ভপাত পরবর্তী সেবা, সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং এইচআইভি/এইড্স এর উপর (২০০৩-২০০৪ সনে) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

নার্সিংঃ বাংলাদেশের নার্সিং ব্যবস্হাপনা এবং এর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষো স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে ১৯৭৭ সালে একটি স্বতন্ত্র সেবা পরিদপ্তর গঠন করা হয়। ১৯৭৭ সালের পর হতে সেবা পরিদপ্তরের কার্যপরিধি ইতোমধ্যেই বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধনকৃত প্রায় ১৯,০০০ রেজিষ্টার্ড নার্স আছেন। তন্মধ্যে ১৪,৬৮৬ জন্য পেশাজীবী নার্স সেবা পরিদপ্তরের অধীনে সরকারি চাকুরিতে কর্মরত আছেন, প্রায় ১,০০০ নার্স বাংলাদেশের বাইরে কর্মরত আছেন এবং প্রায় ৬,০০০ নার্স বিভিন্ন প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করছেন। সেবা পরিদপ্তরের অধীনে মোট ৩৮ টি সরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট আছে। তাছাড়াও একটি আর্মড ফোর্স নার্সিং ইনস্টিটিউট ও ৫টি প্রাইভেট নার্সিং ইনস্টিটিউট আছে। সকল সরকারি ও বেসরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত। উক্ত ইনস্টিটিউটগুলো হতে ৪ বছর মেয়াদি (ডিপ্লোমা-ইন-নার্সিং ৩ বছর ও ডিপ্লোমা-ইন-মিডওয়াইফারি ১ বছর বা সমমানের) ডিপ্লোমা দেয়া হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে পাশ করার পর বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল হতে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হতে হয়। প্রতি বছর সেবা ইনস্টিটিউট হতে প্রায় ৮০০ হতে ১০০০ নার্স পাশ করে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বাস্হ্য সেবার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমুহে ডাক্তার ও নার্সের অনুপাত ১ঃ৩ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে এর ২ঃ১। বাংলাদেশে ডাক্তারের সংখ্যা প্রায় ৪০,০০০, কিন্তু নার্সের সংখ্যা প্রায় ২০,০০০। ফলে ডাক্তারের অনুপাতে নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ বিপুল সংখ্যক নার্স ঘাটতি সমন্বয়সহ চিকিৎসা সেবার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৩ হতে ২০১০ সালের মধ্যে রেজিস্টার্ড নার্স -এর সংখ্যা ২০,০০০ হতে ৩০,০০০-এ উন্নীত করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। বিদ্যমান ৩৮টি এবং বর্তমানে নব নির্মিত/নির্মানাধীন ৭টি নার্সিং ইনষ্টিটিউট ও প্রস্তাবিত আরো ৫টি নার্সিং ইনষ্টিটিউট নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আগামী ১০ বছর পর রেজিস্টার্ড নার্সের সংখ্যা ২০,০০০ হতে ৩০,০০০-এ উন্নীত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এ ছাড়াও সেবা পরিদপ্তরের অধীনে ৪টি বিভাগীয় এডুকেশন সেন্টার ও উপজেলা পর্যায়ে ২টি পল্লী নার্সিং টেনিং সেন্টার আছে। এগুলোতে নার্সদের বিভাগীয় পর্যায়ে ইনসার্ভিস প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এবং নার্সিং কারিকুলাম অনুযায়ী নার্সিং ছাত্র/ছাত্রীদের ফিল্ড প্র্যাকটিস কার্যক্রম চালু আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ঢাকায় একটি সেবা মহাবিদ্যালয় আছে। এখানে নার্সদের ২ বছর মেয়াদী বিএসসি ইন নার্সিং ও বিএসসি ইন পাবলিক হেলথ নার্সিং ডিগ্রী দেয়া হয়ে থাকে।

ঔষধ শিল্প ঃ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বল্পোন্নত দেশ হয়েও বিগত কয়েক বছরে ঔষধ শিল্পে প্রশংসনীয় উন্নতি সাধন করেছে। খুবই উন্নত প্রযুক্তির কিছু ঔষধ ছাড়া প্রয়োজনীয় প্রায় সকল প্রকার ঔষধ বর্তমানে স্হানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। সর্বমোট ২৩৩টি এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বছরে প্রায় ১২০০০ ব্রান্ডের ৪১০০ কোটি টাকার ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল উৎপাদন করছে। দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৬ ভাগের বেশী ঔষধ বর্তমানে স্হানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। এর পাশাপাশি জাতীয় স্বাস্হ্য সেবায় আইনগত স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রাচ্যের স্বদেশজাত শাস্ত্রীয় ও পাশ্চাত্যের হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধের অবদানও উল্লেখযোগ্য। ঔষধ শিল্পে জিএমপি অনুশীলনে অগ্রগতি ও উৎপাদিত ঔষধ আন্তজার্তিক মান সম্পন্ন বিধায় বর্তমানে দেশে উৎপাদিত ৪২ প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় ৬২টি দেশে রপ্তানি হয়ে আসছে এবং এ সুবাদে বাংলাদেশ ঔষধ শিল্পে আমদানীকারক দেশের পরিবর্তে রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে গৌরব অর্জন করছে।

২০০১ সালে বাংলাদেশ গ্লবকৎগ্ধথ পৃথিবীর ১৭টি দেশে মোট প্রায় ৩২.২৮ কোটি টাকার ঔষধ ও কাঁচামাল রপ্তানি করেছিল গ্ধলকৎগ্ধথ ২০০৪ সালে ৬২টি দেশে প্রায় ১৫৩.৯০ কোটি টাকার ঔষধ ও কাঁচামাল রপ্তানি করেছে।

জাতীয় ঔষধ নীতি প্রবর্তনঃ WTO/TRIPS এর আওতায় পরিবর্তিত আর্থ সামাজিক বিশ্ব ব্যবস্হার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে ঔষধ শিল্পে আধুনিকায়ন, প্রসার ও বিদেশী বিনিয়োগকে আরো বেশী আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিদ্যমান জাতীয় ঔষধ নীতি ১৯৮২ কে অধিকতর গ্রহণযোগ্য, সময়োপযোগী ও হালনাগাদ করার উদ্দেশ্যে জাতীয় ঔষধ নীতি ২০০৫ প্রণয়ন করেছে। জাতীয় ঔষধ নীতি ২০০৫ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভোক্তাস্বার্থ অধিকতর সংরক্ষিত হবে এবং বিশ্বব্যাপী মুক্ত বাজার অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ক্রমবর্ধমান রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রসার ঘটবে এবং দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের পরিবেশ আরোও সম্প্রসারিত হবে।

পুষ্টি ঃ জনগণের পুষ্টি মানের উন্নয়ন বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক অঙ্গীকার। পরিস্হিতির যথেষ্ট উন্নয়ন সত্ত্বেও বাংলাদেশের ব্যষ্টিক ও অনুপুষ্টির ঘাটতি এখনও কাংখিত পর্যায়ের নয়। তবে সরকার পুষ্টি উন্নয়নের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছে।

সার্বিকভাবে সেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধির ফলে পরিচালন বাবদ সরকারের রাজস্ব ব্যয় আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় উন্নয়নখাতে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে বরাদ্দ ছিল ১২৮৬.১৫ কোটি টাকা, ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ ছিল ১৩৩৩.৬৯ কোটি টাকা যা পুর্ববর্তী অর্থ বছরের চাইতে ৪৭.৫৪ কোটি টাকা বেশী, ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ ছিল ১৪০৯.৮১ কোটি টাকা যা পুর্ববর্তী অর্থ বছরের চাইতে ৭৬.১২ কোটি টাকা বেশী এবং ২০০৪-০৫ অর্থবছরে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসুচীসহ ৯টি বিনিয়োগ ও ৭টি কারিগরী সহায়তাসহ মোট ১৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকুলে বার্ষিক উন্নয়ন কমসুচীতে মোট ১৯৫৪.৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা পুর্ববর্তী বৎসরের চাইতে ৫৪৪.৯৭ কোটি টাকা বেশী। ইতোমধ্যে হাসপাতালগুলোতে রোগীদের পথ্য খাতে বরাদ্দ দৈনিক জনপ্রতি ৩০ টাকা হতে ৪৫ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে এবং এম এস আর খাতেও আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

নারী ও শিশু উন্নয়ন

দেশের নারী সমাজ সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের অন্যতম শক্তি। তাঁদের বাইরে রেখে উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ উপলব্ধি থেকে নারী-পুরুষের অসমতা দুরীকরণের লক্ষ্যে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের কর্মসুচি গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমানে ত্রি-বার্ষিক আর্বতক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ পরিকল্পনায় মহিলা উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মহিলাদের জন্য সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে ত্রি-বার্ষিক আবর্তক কর্মসূচি পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলঃ

- সর্বস্তরে নারী ও পুরুষদের মধ্যে সমতা এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে সম-অংশিদারিত্ব অর্জন;
- মহিলাদের অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতাসহ অর্থনৈতিক সম্পদ যেমন-জমি, মুলধন এবং প্রযুক্তির উপর অধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ অর্জন;
- উন্নয়ন ক্ষেত্রে নারী ও পুরষের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে- এবং কৃষি, শিল্প ব্যবসা আধুনিক প্রযুক্তি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে মানব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার;
- মহিলাদের প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধ করা ও মহিলা ও শিশু-পাচার প্রতিরোধ করা;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

সরকার কর্তৃক ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতিমালার আওতায় এদেশের নারীদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডের বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশ গ্রহণ এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার কাজ এগিয়ে চলছে। শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে গৃহীত হয়েছে জাতীয় শিশু নীতি। শিশু অধিকারের বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য ২০০১-২০১০ সালকে 'শিশু অধিকার দশক' ঘোষণা করা হয়েছে।

নারী ও শিশুদের অবস্থার উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের তিনটি অধীনস্থ সংস্থা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। মহিলা উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর দেশের ৬৪টি জেলা এবং ৪০৫টি উপজেলায় রাজস্ব বাজেটের আওতায় মহিলা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচি চালু রেখেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো হলঃ

- খাদ্য নিরাপত্তাহীন দরিদ্র মহিলাদের উন্নয়ন;
- মহিলাদের প্রশিক্ষণ একাডেমী;
- কর্মজীবী মহিলাদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কর্মসূচি;
- শিশু পাচার রোধকল্পে সমন্বিত কর্মসূচি;
- কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ;
- মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট , মহিলা হস্তশিল্প ও কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মহিলা শিশু ও কিশোরী হেফাজতিদের নিরাপত্তা আবাসন প্রকল্প;
- জেলা শহরে শ্রমজীবী মায়েদের শিশুদের দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং ছিন্নমূল মেয়ে শিশুদের নিরাপদ আবাসন ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র;
- ''ইনকান্ট্রি ট্রেনিং প্রোগ্রাম ফর দা এগ্রিকালচারাল ট্রেনিং ফর উইমেন ইন বাংলাদেশ উইথ দ্য ফিনান্সিয়াল এন্ড টেকনিক্যাল সার্পোট ফ্রম জাইকা এন্ড ওয়েস্কা'';
- ''এ্যাডভোকেসী টু এন্ড জেন্ডার বেজড ভায়োলেন্স থ্রু মিনিষ্ট্রি অফ ওমেন এন্ড চিলড্রেন এফেয়ার্স''। এছাড়া জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে নীতি, নেতৃত্ব ও এ্যাডভোকেসীর উদ্দেশ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, জাতীয় নারী-নীতি বাস্তবায়ন এবং সুশীল সমাজ ও সরকারের অংশগ্রহণের সমন্বয় সাধন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ২০টি প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে ৬৯.১৬ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৬২.৭৭ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯১%। এছাড়া চলতি ২০০৪-০৫ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের ৩৮টি প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে ৬৭.৪৬ কোটি টাকা এবং মার্চ, ০৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৮.১৯ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৫৭%।

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জাতীয় মহিলা সংস্থা ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছর থেকে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।। মার্চ, ০৫ পর্যন্ত এ দুটি সংস্থা ক্রমপুঞ্জিত মোট ২৫৮.২৬ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ এবং ১৭৩.৬২ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে। এ কার্যক্রমের ফলে দেশব্যাপী হাজার হাজার নারীর ক্ষমতায়ন ও মহিলা উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে।

সমাজকল্যাণ কার্যক্রম

দুঃস্থ, দরিদ্র ও অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। বর্তমান সরকার এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশের বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসনের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও এ মন্ত্রণালয় কিশোর অপরাধ দূরীকরণ, শারীরিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের পুনর্বাসন, এতিম ছেলে-মেয়েদের লালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসন, পরিত্যক্ত ও দাবীদারবিহীন নবজাতক শিশুদের লালন-পালন, ভবঘুরে পুনর্বাসন, নিরাপদ আবাসনসহ বহুবিধ কার্যক্রম সমগ্র দেশব্যাপী পরিচালনা করছে।

এ কার্যক্রমসমূহকে প্রধানতঃ সামাজিক সংহতি উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনমূলক কার্যক্রম, পরিবেশ ও বন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হিসেবে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়ে থাকে।

ক) **সামাজিক সংহতি উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনমূলক কার্যক্রমঃ** সামাজিক সংহতি উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মধ্যে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি অন্যতম। বর্তমানে দেশের সকল উপজেলা ও শহরে সমাজ সেবা অধিদপ্তর পল্লী সমাজ সেবা কার্যক্রম (আর,এস,এস), শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম (ইউ,সি,ডি), পল্লী মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন (আর,এম,সি) এবং এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ৪টি কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ঘূর্ণায়মান তহবিলের অধীন নতুন বিনিয়োগ ও পুনর্বিনিয়োগ করা হয়। এ ৪টি কার্যক্রমে মোট মূল বিনিয়োগের পরিমাণ ১৮৮৮৫.০৩ লক্ষ টাকা হলেও পুনর্বিনিয়োগসহ ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত মোট ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৫৬৬৬.৯৩ লক্ষ টাকা। একইভাবে ক্রমপুঞ্জিত আদায়ের পরিমাণ ৫০২৫৫.৬৮ লক্ষ টাকা এবং গড় আদায়ের হার প্রায় ৯০%। এ ৪টি কার্যক্রমের অধীন ঘূর্ণায়মান তহবিলের মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত সময়ে মোট ২৫৭৫৫৭টি পরিবার উপকৃত হয়। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট উপকৃতের সংখ্যা ২২৪১৪৪৮ জন। সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা ২৯৪১৯০০ জন। সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে ১৫৭০১০৮ জনকে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা প্রদান করা হয়েছে ১০৮৮৮৭৭ জনকে। ছোট পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে ২২৩৪০৬০ জনকে।

খ) **পরিবেশ ও বনঃ** দেশের সকল উপজেলা ও শহরে সমাজসেবা অধিদপ্তর পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আর,এস,এস) এর মাধ্যমে বনায়ন কার্যক্রম সফল করার লক্ষ্যে ১৯৮৩২৭৪টি চারা বিতরণ করেছে।

গ) **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিঃ** বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত, অবহেলিত, আর্থিক দৈন্যে জর্জরিত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিচেনা করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বয়স্কভাতা কর্মসূচির জন্য ২৬০৩৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর ফলে ১৩ লক্ষ ১৫ হাজার ভাতাভোগী উপকৃত হচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ঘ) **মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমঃ** এতিম শিশুদের জন্য ৭৪টি সরকারি শিশু পরিবারের মাধ্যমে ৯৬০০ জন এতিম শিশুর ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত নিবন্ধনকৃত এতিমখানায় প্রতিপালিত শিশুদের মধ্যে মাসিক মাথাপিছু ৪০০/- টাকা হারে ২৯১৬৬ জন শিশুর মধ্যে ১৪ কোটি টাকা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্রের (পিআরএসপি) সাথে সংগতি রেখে আগামীতে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি অধিক সুসংহতকরণসহ নতুন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিয়েছে।

যুব ও ক্রীড়া

যুবঃ দেশের যুব সমাজের অবস্থান জাতীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলের কেন্দ্রবিন্দুতে। জাতীয় উন্নয়নে যুব সমাজের সম্পৃক্ততার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ প্রেক্ষাপটে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৯৮১ সালে সৃষ্টিলগ্ন থেকে বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পসহ চলমান প্রকল্পগুলোর আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে ডিসেম্বর, ২০০৪ পর্যন্ত ২৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৭৩৮ জন যুব ও যুবমহিলাকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে থেকে ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত ১৩ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৭৯ জন যুবক ও যুব মহিলা আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে সক্ষম হয়েছে। অধিদপ্তরের ঋণ কর্মসূচীতে সৃষ্টিলগ্ন থেকে ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত ৬ লক্ষ ৪০ হাজার ২৪০ জন উপকারভোগীকে ঘূর্ণায়মান তহবিলসহ ৫৬৯ কোটি ৯৩ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তম্মধ্যে ২০০৩-২০০৪ সালে ৪৩ হাজার ১৬১ জন উপকারভোগীর মধ্যে ঘূর্ণায়মান তহবিলসহ ৩৪ কোটি ৬৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে নিয়োজিত যুবদের মাসিক গড় আয় ১,৫০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত। এছাড়া, অনেক যুব ও যুবমহিলা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি লাভ করেছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে চাকুরী লাভে সক্ষম হয়েছেন।

যুব কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ি ২০ একর পর্যন্ত খাস ও বদ্ধজলাশয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত যুব সমবায় সমিতিকে ইজারা দেয়ার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দেয়। সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী এ সব জলাশয় জেলা/উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে যুব সমবায় সমিতিকে ইজারা প্রদান করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যুবদের কর্মসংস্থানের জন্য ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত ১১,২৩১টি জলাশয় যুব সমবায় সমিতিকে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। জলাশয় ইজারা বাবদ প্রাপ্ত ১৮ কোটি ৮৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা সরকারের কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারে কাজ করছে। দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার যুবদের ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটার বেসিক কোর্স ও গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ৫১৪৯২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জনসংখ্যা সমস্যা সমাধান, প্রজননস্বাস্থ্য, এইচআইভি, এইডস, স্যানিটেশন কর্মসূচিতে যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে দেশের সকল উপজেলার ৫০০টি যুব ক্লাবের মাধ্যমে ইউএনএফপিএ-এর আর্থিক সহায়তায় একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প চালু আছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে জেন্ডার ইস্যু, এইচআইভি, এইডস, স্যানিটেশন, পরিবেশ উন্নয়ন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া নিরাপদ মাতৃত্ব ও কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউ এন এফ পি এ -এর আর্থিক সহায়তায় দেশের ৩০টি উপজেলায় ৬০টি যুব ক্লাবের মাধ্যমে অপর একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে যার মাধ্যমে মোট ২৯০৭৯ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ এবং যুবসমাজের সামাজিক অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন, তাদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান ও সামাজিক সংস্কারের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মেলন, সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশিবির, গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে 'জাতীয় যুব কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় যুব কেন্দ্র মূলত একটি মানব সম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র । এ কেন্দ্রের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ৬৫৮৩ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে যুব সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের একটি মুখ্য দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অদিদপ্তরে যুব সংগঠন তালিকাভুক্তির কাজ চলছে। এ পর্যন্ত মোট ৬৭৩৫টি যুব সংগঠনকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে মোট ৭৪৭টি যুব সংগঠনকে ৭৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা প্রকল্প ভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

ক্রীড়াঃ ক্রীড়া উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও সরকার দেশে খেলাধূলার সুবিধাবলী সৃষ্টি, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে উপযুক্ত অর্থ বরাদ্দসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। চলতি অর্থবছরে ১৬টি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত ৩২ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা হতে ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত ১৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

একটি দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও মানব উন্নয়ন নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। সাংস্কৃতিক বিকাশের স্তর একটি জাতির উন্নয়নমুখী কার্যক্রমের গতিধারাকে প্রভাবিত করে।

বিশ্ব সংস্কৃতির উন্নয়নের গতিধারার সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন অবকাঠামো সৃষ্টি জোরদার করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, বাংলা একাডেমী, জাতীয় যাদুঘর, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, নজরুল ইন্সটিটিউট, লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন, কপিরাইট অফিস, কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং রাংগামাটি, বান্দরবন ও বিরিশিরি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউটসমূহ সারা দেশে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের প্রয়াসে নিয়োজিত। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচিতির ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সমঝোতার লক্ষ্যে বিশ্বের ৩৯টি দেশের সাথে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে। সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমের আওতায় আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল, ছাত্র, শিক্ষাবিদ, পণ্ডিতগণ, সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের বিনিময়-সফর (exchange visits) কার্যকর হচ্ছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর আমাদের সংগীত, নৃত্যশিল্প, চিত্রকর্ম, হস্তশিল্প ও পুস্তক প্রদর্শনীর কার্যক্রম গতিশীল করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল জেলায় জেলা শিল্পকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে মফস্বলের কণ্ঠ, নৃত্যশিল্পীসহ ললিতকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নাটক, সংগীত ও নৃত্যকলার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সেগুনবাগিচাস্থ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী চত্বরে ৭৫০ আসন বিশিষ্ট মূল থিয়েটার হল ও ৩০০ আসন বিশিষ্ট এক্সপেরিমেন্টাল হলসহ জাতীয় নাট্যশালা ভবন নির্মিত হয়েছে। জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র ও জাতীয় চিত্রশালা ভবন নির্মাণের কাজও সমাপ্তির পথে। তাছাড়া খাগড়াছড়ি, মৌলভীবাজার ও রাজশাহীতে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, কুষ্ঠিয়ায় লালন একাডেমি ইত্যাদি অবকাঠামোও ইতোমধ্যে নির্মিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষা, সাহিত্য ও লোকগাঁথা উন্নয়নে বাংলা একাডেমী বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেছে এবং বাংলা একাডেমী ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন বই মেলার আয়োজন করছে। কেন্দ্রীয় এবং বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের গণগ্রন্থাগার স্থাপনে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত গণগ্রন্থাগারের উন্নয়নে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জাতির গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তিসমূহ পুনরুদ্ধার ও রক্ষাকল্পে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।
সংস্কৃতি খাতের উন্নয়ন প্রয়াসকে অব্যাহত রাখা ও জোরদার করার লক্ষ্যে ২০০৪-০৬ সালের ত্রিবার্ষিক আবর্তক কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য হারে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। চলতি ২০০৪-০৫ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মোট ১৩ (তের)টি প্রকল্পের জন্য ৫৭.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তাছাড়া আপততঃ আরও ৭(সাত)টি নতুন প্রকল্পের জন্য ১০ কোটি টাকার থোক বরাদ্দও রয়েছে।

UNDP কর্তৃক প্রকাশিত Human Development Report ২০০৩ ও ২০০৪ অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচকের নিরিখে বাংলাদেশের সাফল্য লক্ষনীয়। পর পর দু'বার বাংলাদেশ, শ্রীলংকা ও ভারতের মত মধ্যম পর্যায়ে (Medium Human Development) দেশ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। মানব উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসসহ সরকার কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ বাস্তবমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলেই এ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলনে (UNCTAD) স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) জন্য ২০০৪ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়, শিক্ষায় নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর ও নিরাপদ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার দু'টি অভীষ্ট অর্জন করেছে। মানব কল্যাণের লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক স্থিরকৃত অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রাও বাংলাদেশ অর্জন করতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে।